হরেক রকম দেশীয় মাছের চাষ

আমাদের দেশে আগে হাওড়-বাওড়-বিলে এক সময় প্রচুর পরিমাণে দেশীয় প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। এসব প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট হাওড়-বাওড়গুলোর কিছু কিছু জায়গায় সারা বছরই পানি থাকতো। এতে বছর শেষে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় প্রজাতির মাছ থেকে যেত যা থেকে পরবর্তী বছরে দেশীয় প্রজাতির মাছের জন্ম হত। কিন্তু দিনে দিনে প্রাকৃতিকভাবে এসব হাওড়-বাওড়গুলোর তলা ভরাট হয়ে যাওয়াতে এসব আশ্রমগুলো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আগে যেখানে সারাবছর পানি থাকতো সেখানে আজ ভরা মৌসুমেও পানি থাকে না। যার কারণে এসব শুকিয়ে যাওয়া হাওড়-বাওড়গুলোতে এখন ধান আবাদ হচ্ছে। এর পরে অনেক জলাভূমিতে পানি থাকলেও সেখানে মাছের অস্থিত্ব থাকা পর্যন- সেচ দিয়ে এসব মাছগুলোকে মেরে সাফ করে দেয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পরের বছর মাছের প্রজন্মের জন্য অবশিষ্ট আর কিছুই থাকছে না। এভাবে দেশীয় প্রজাতির মাছ এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। ইতিমধ্যে অনেক মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চৈত্র-বৈশাখের খরার পর আষাঢ়ে বৃষ্টির পানি পেলেও মাছের দেখা মেলে না আজকাল। ছোটবেলায় দেখেছি আষাঢ়ের বৃষ্টির পর ডোবা, খাল, বিল ছোট ছোট মাছে_ যেমন মলা, দারকিনা, কয়েক প্রজাতির পুটি মাছ, টেংরা, গুলশা, খলিশা, চান্দা ইত্যাদি নানান প্রজাতির মাছে ভরে যেত। কিন্তু এখন আষাঢ়ে বৃষ্টি হলে খালে-বিলে পানি হলেও এসব মাছ আগের মত দেখা যায় না। নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখেছি, খালে-বিলের এসব ছোট ছোট মাছ প্রতিমাসেই একবার করে বাচ্চা দেয়। যার ফলে ভরা বর্ষা মৌসুমে এসে খাল-বিল মাছে ভরে যেত। কিন্তু বর্তমানে মাছে আর আগের মত ডিম দিতে পারে না। এর কারণ, কয়েক মাস পানি থাকলে ছোট মাছের বংশ বৃদ্ধি ঘটে না।

আগের ইংরেজ শাসকদের শাসন আমলকে যে জোঁকের সাথে তুলনা করা হত সেই জোঁকও এখন আর খালে-বিলে পাওয়া যায় না। অথচ আমরা ছোটবেলায় দেখেছি জোঁকের জন্য খালে-বিলে নামা যেত না। পানিতে নামলেই বিভিন্ন প্রজাতির জোঁক আসতো ধরতে। এখন বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যেও সেই জোঁকের দেখা মেলে না। আগে শামুকের দেখাও মিলতো প্রচুর। খাল-বিলের পাড়ে প্রচুর পরিমাণে সাদা শামুকের ডিমের ছোট ছোট স্তুপ দেখা যেত। বিভিন্ন মৎস্য খামারের খাদ্য হিসেবে শামুক ব্যবহার হওয়াতে এখন শামুকের সংখ্যাও কমে গেছে। এর জন্য দায়ী আমরাই। নানা কারণের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি আমরা। এ ছাড়াও অবাধে কীটনাশক ব্যবহার করছি। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এসব মাছ, শামুক বা প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমেও মাছের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না। কয়েক মাস ধরে খাল-বিল থেকে দূষিত পানি বেরিয়ে যাবার পর মাছের প্রজনন উপযোগী হতে হতে ততদিনে মাছের প্রজনন মৌসুম শেষ হয়ে যায়। এর পরেও একটি উলে-খযোগ্য পরিমাণের ছোটমাছ বংশ বৃদ্ধি করে। এভাবেই আমাদের দেশের ছোট মাছের বংশ বৃদ্ধির হার একেবারে কমে গেছে। হারিয়ে গেছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক প্রজাতির মাছ। সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটি অতীত ঐতিহ্যে।

প্রাকৃতিক জলাশয় বিভিন্ন কারণে সংকুচিত হচ্ছে এটাকে মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। কেননা, আমাদের খাদ্য চাহিদার বিপরীতে ধানের আবাদ যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কীটনাশকের ব্যবহার। আমাদের সবদিকেই খেয়াল রাখতে হবে। ধানের উৎপাদনের কথা মাথায় রাখতে হবে। আবার মাছের বংশ বৃদ্ধির কথাও চিন্তা করতে হবে। কেননা, প্রকৃতি যেভাবে যাচ্ছে আমাদেরও সেভাবে যেতে হবে। কারণ, প্রকৃতিকে ধরে রাখার সামর্থ আমাদের নেই। তবু বিভিন্নভাবে এর লাগাম টেনে এর গতি মন্থর করতে হবে। প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়েই প্রকৃতিকে জয় করতে হবে। আর তাই বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যেও বৃষ্টির কিছুদিন পর পানিতে বিষক্রিয়া কিছুটা কমে গেলে যখন মাছ প্রাকৃতিক জলাশয়ে ডিম পাড়া বা বাচ্চা দেয়া শুরু করবে তখনই কারেন্টজালের ব্যবহার কঠোর হাতে দমন করতে হবে। প্রথমত, যদিও সরকারিভাবে কারেন্টজাল ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু এর কোন প্রয়োগ বাস-বে লক্ষ্য করা যায় না। আমি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, জৈষ্ঠ্যে যে মাছগুলো ডিম পাড়ে সেই বাচ্চাগুলোই পরবর্তীতে ২/৩ মাস পর থেকে আবার প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে আবার বাচ্চা দিয়ে থাকে। বিশেষ করে দারকিনা, পুটি, ছোট খলিশা, কৈ, খলিশা, টাকি, শিং ইত্যাদি। আর তাই এদের প্রজননের ওপর বিশেষভাবে সচেতন হলে এখনও আশ্বিন-কার্তিকে এসে প্রচুর পরিমাণে ছোটমাছ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস-বে যা ঘটে তা হল যখন বৈশাখে প্রথম বাচ্চা হয় সেই বাচ্চাগুলো প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই কারেন্টজাল দিয়ে সমূলে বিনাশ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে যে কি পরিমাণে কারেন্টজাল ব্যবহার করা হয় তা হয়তোবা অনেকেরই জানা নেই। খাল-বিলে অসংখ্য কারেন্টজাল

অবাধে ব্যবহার করা হয় নিয়মিত প্রতিযোগিতার মত। শুধু কারেন্টজালের ব্যবহার বন্ধ করতে পারলেই এইসব ছোট ছোট মাছের উৎপাদন জ্যামিতিকহারে বহুগুণ বেড়ে যাবে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। দ্বিতীয়ত, সীমিত আকারে হলেও উপজেলাভিত্তিক একটি করে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা উচিত। অভয়াশ্রমগুলো এভাবে করা উচিত যেন আশ্রমের একদিক দিয়ে পানির স্রোত এসে অন্য দিক দিয়ে স্রোত বয়ে যেতে পারে। তাতে বর্ষার প্রাক-মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে এইসব ছোট ছোট মাছ ডিম ছাড়তে পারে। যা পরবর্তীতে এই সব মৎস্য অভয়াশ্রাম হতে ছোট মাছের মাতৃমাছ বা ছোটমাছ স্থানান্তরিত হয়ে সমস্ত এলাকা ছড়িয়ে যাবে। যেহেতু এইসব ছোটমাছ খুবই দ্রুত এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও কিছু কিছু ছোট মাছকে পুকুরেই বংশ বৃদ্ধি করানো যেতে পারে। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ধারাবাহিকভাবে লেখার আশা রাখছি।

আমাদের ধানের উৎপাদন একদিকে যেমন বাড়াতে হবে অন্যদিকে ভিটামিনের চাহিদা পূরণের সর্বাত্মক উৎপাদনের চেষ্টা চালিয়ে যেত হবে। আমাদের দেশে ছিল এক সময় গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। সেদিনের বাসৎদবতা আর বর্তমানের প্রেক্ষিত সবকিছু বিবেচনা করেই আমাদের এগোতে হবে। আগের ইতিহাসে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে দেখবো যে, আগে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। সে হিসেবে জমির পরিমাণ ছিল বেশি। প্রচুর জলাশয়, ভূমি তখন অব্যবহৃত থেকে যেত। জলাশয়গুলোতে অবাধে মাছ বিচরণ করতো বছরের পর বছর। মানুষের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হত অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ ধানের ক্ষেত্রে বলা যায়, বর্তমানের চেয়ে ধানের উৎপাদন অতীতে অনেক কম হলেও শেরশাহ এর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এ কথাগুলো লেখার অর্থ হল অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষিতের একটি বাসৎদবচিত্র তুলে ধরা। আমাদের এই বাসৎদবতাকে মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে হবে। আমাদের প্রাকৃতিক জলাশয় সংকুচিত হয়ে আসছে। সেজন্য এই অবস্থানের কথা চিনৎদা করেই আমাদের দেশীয় ছোট ছোট প্রজাতির মাছগুলো রক্ষার বা প্রজননের উদ্যোগ নিতে হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে মলা মাছ কীভাবে পুকুরে চাষ করতে হয় তা উল্লেখ করছি-

পুকুরে মলা মাছের চাষ : পুকুরেই হবে মলা মাছের চাষ। আগে আমরা দেখতাম খালে-বিলে দল বেঁধে মলা মাছ চলাফেরা করতো। আর এরা ধরাও পরতো ঝাঁকে ঝাঁকে। ছোটবেলায় আমরা খুব মজা করে মলা মাছ মারতাম- বিশেষ করে ছিপজাল দিয়ে। কোন এক স্রোতের মুখে এই জাল ফেলে বসে থাকতাম। পানি একটু স্বচ্ছ হলে পরিস্কার দেখা যেত দল বেঁধে মলা মাছ আসছে। ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারলে পুরো মলা মাছের দলটিকে জালে উঠিয়ে ফেলা যেত। পুরো দল মানে অনেক মাছ। এই মাছটি বর্তমানে বিপন্নের পথে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই এই মাছটিকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মলা মাছের পুষ্টিগুণ ও ওষুধিগুণের কথা সবারই কম বেশি জানা আছে। মলা মাছ পুকুরেই ডিম দিয়ে থাকে। দরকার শুধু উদ্যোগের। একবার শুধু কিছু মলা মাছকে পুকুরে ছেড়ে দিলেই হল। এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মাস দুয়েক পর থেকেই মলা মাছ পুকুরে ডিম দিতে শুরু করে। একক চাষেও মলা মাছের সম্ভাবনা আছে। একক চাষের জন্য প্রথমে পুকুরে রটেনন দিয়ে অবঞ্চিত মাছ মেরে ফেলতে হবে। তারপর চুন দিয়ে পরিস্কার পানিতে পুকুর পূর্ণ করতে হবে। পানি ৩ ফুট রাখা বাঞ্চনীয়। এরপর আশপাশের যেকোন উৎস হতে কিছু মলা মাছের পোনা বা বড় মলা মাছ পুকুরে ছাড়তে হবে। জীবিত মলা মাছ পরিবহন করা কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আশেপাশের যে কোন উৎস হতে খুব সর্তকতার সাথে মলা মাছ বহন করতে হবে। একবার মাছ স্টক হলেই হল। প্রজননের জন্য আর কিছুর প্রয়োজন নেই। মাসখানেক পর থেকেই মলা মাছ ডিম দিতে শুরু করবে। প্রথম দুইমাস কোন মাছ ধরা যাবে না। শুধু বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। দুইমাস পর থেকে প্রতি ১৫ দিন অনৎদর অনৎদর মাছ আহরণ করা যাবে। মাছ আহরণের সময় এমন জাল ব্যবহার করতে হবে যাতে শুধু বড় মলা মাছগুলো জালে উঠে আসে। আর ছোট মাছগুলো জালের ফাঁক দিয়ে পুকুরে চলে যায়। এভাবে প্রতি ১৫ দিন পর পর মাছ ধরা যাবে। মলা মাছের প্রচুর পরিমাণে প্রজননের জন্য অমাবস্যায় বা পূর্ণিমার রাতে পুকুরে শ্যালো দিয়ে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাচ্চা পাওয়া যাবে। খাবার হিসেবে শুধুমাত্র অটোকুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। খাবার পুকুরে ভাসিয়ে দিতে হবে। অন্য খাবার ব্যবহার করলে পুকুরের পানির রঙ সবুজ হয়ে যেতে পারে। পানি বেশি সবুজ হলে মলা মাছের ডিমপাড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা বাচ্চা দেয়ার হার কমে যেতে পারে। কারণ, মলা মাছ স্বচ্ছ পানিতে বাস করতে ও প্রজনন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ জন্য খাবার হিসেবে অটোকুঁড়া দিলে ভাল। অটোকুঁড়া পানিতে ভেসে থাকে বিধায় সমসৎদ খাবার মাছে খেয়ে ফেলতে পারে। তাই পানিও পরিস্কার থাকে।

মলা মাছের বাজারজাত : মলা মাছ একটি নরম প্রকৃতির মাছ। পুকুর থেকে মাছ আহরণের পর মলা মাছকে বেশিক্ষণ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা যায় না। ২ থেকে ৩ ঘন্টা পর থেকেই মলা মাছ পচে যাওয়া শুরু করে। তাই মলা মাছকে পুকুর থেকে ধরেই বরফ দিতে হবে। এভাবে মাছ সংরক্ষণ করলে ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা পর্যনৎদ টাটকা অবস্থায় রাখা যায়। এ সময়ের মধ্যে দেশের যে কোন প্রানৎদে বাজারজাত করা সম্ভব।

মলা মাছের উপযোগিতা : মলা মাছ চাষের খাদ্য খরচ কম। পোনা কিনতে টাকার দরকার হয় না এবং বাজারমূল্য উচ্চ হওয়ার কারণে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চাষ করা যেতে পারে।

এখন পুকুরে কীভাবে শোল মাছের পোনা উৎপাদন করা যায় তার বিবরণ থাকছে-

শোল মাছের প্রজননের অভিজ্ঞতার কথা: ২০০০ সালে অমি বিভিন্ন হাওড়-বাওড় থেকে বিভিন্ন আকৃতির প্রায় হাজার খানেক শোল মাছ সংগ্রহ করি প্রজননের জন্য। এর আগে ১৯৯৮ সালে দেশী মাগুর ও ১৯৯৯ সালে শিং, ২০০০ সালে চিতল ও ফলি মাছের প্রজননে সফলতা পাই। শিং ও মাগুর মাছের প্রজননে সফলতাই আমাকে শোল মাছের প্রজননে উদ্বুদ্ধ করে। আগেই উল্লেখ করেছি, হাওড়-বাওড় থেকে প্রায় হাজার খানেক শোল মাছ সংগ্রহ করি। পুকুরে ব্রুড শোল মাছগুলোকে মজুদ করার পর ব্যাপক ক্ষত দেখা দেয়। তখন ছিল শীতকাল। শীতকালে শোল মাছে এমনিতেই ব্যাপক ক্ষত রোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন চিকিৎসা শেষে মাছ সুস্থ হল কিন্তু হাজার খানেক থেকে ৮০ টির মত কংকাল সার মাছ পাওয়া গেল। কোন খাবার খায় না। খাবার নষ্ট হতে হতে পুকুরের পানি নষ্ট

হয়ে গেল। অজানা পথে অনেক টাকার অপচয় করলাম। এ দিকে শোলমাছগুলোকে আমার পাকা পুকুরে স্থানান্তর করলাম। শোল মাছগুলোকে পাকা পুকুরে স্থানান্তর করার পর আরও কয়েকটি মাছ মারা গেল। কোন অবস্থাতেই খাবার খাওয়াতে পারছিলাম না। অনেক টাকা বিনিয়োগ করার পরও যখন কোন অবস্থাতেই শোল মাছগুলোকে খাওয়াতে পারছিলাম না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওই পুকুরের পাড়ে বসেছিলাম। হঠাৎ করে একটি ছোট ব্যাঙ লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ে গেল। আর পড়ে যাওয়া মাত্রই কয়েকটি শোল মাছগুলো দৌড়ে এল। মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাঙটিকে নিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে আমিও পেয়ে গেলাম শোল মাছের খাবার। যারা খালেবিলে মাছ ধরে তাদের ছোট ব্যাঙ ধরে আনতে বললাম। প্রথম দিন প্রায় ৫ কেজি ব্যাঙ ধরে পাকা পুকুরে ছাড়া মাত্রই সমস্ত পুকুর জুড়েই এক ঝলকে তাণ্ডব হয়ে গেল। ৫ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ব্যাঙগুলোকে উদরে পুড়ে ফেলল ক্ষুধার্থ শোল মাছগুলো। প্রথম দিকে আমি এ দৃশ্য দেখে খুবই তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। কিন্তু পর মুহূর্তে আমার মধ্যে একটা অনুশোচনা কাজ করল এই জন্য যে, এতগুলো ব্যাঙকে এ ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া উচিৎ হয়নি। সপ্তাহখানেক শোল মাছকে খাবার না দিয়ে পরবর্তীতে আবার ব্যাঙ দিতে শুরু করি এই ভেবে যে, সবই একটি ধারাবাহিক পদ্ধতির মধ্যে চলে। বিলে এই মাছ থাকলে কোন না কোনভাবে ব্যাঙ বা অন্যকোন জলজ প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকতো। এভাবে নিয়মিত ব্যাঙ খাওয়ানোর পর মাছগুলো হয়ে উঠল বেশ মোটাতাজা। এরপরে এল বৈশাখ মাস। মাছগুলোর পেটে ডিম এল। প্রজনের জন্য একজোড়া পুরুষ ও একজোড়া স্ত্রী শোল মাছ নির্বাচন করলাম। ২টি মাত্রায় পি.জি. হরমোন দিয়ে ইঞ্জেকশান করলাম। ২টি মাত্রাতেই ডিম দিল ঠিকই কিন্তু পুরুষ মাছের স্পার্ম পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি পুরুষ মাছের পেট কেটে টেস্টিজ বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অন্যান্য মাছের মত শোল মাছের টেস্টিজের আকার স্পষ্ট না থাকায় বুঝা যাচ্ছিল না কিছুই। অনেকটা ফুলের মত টেস্টিজে স্পার্ম থেকে কেটে তাড়াতাড়ি ডিমের সাথে পাখির পালকের সাহায্যে মিশিয়ে বোতল জারে দেয়া হল। কিন্তু ডিমগুলো বোতল জারে ভেসে উঠল। ডিমগুলো পানিতে ভেসে থাকাতে দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। এর আগে কখনও মাছের ডিম পানিতে ভেসে থাকতে দেখিনি। এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম আমি। শোল মাছের ডিম পানিতে ভেসে থাকতে দেখে মনে হল এভাবে ডিম ভেসে থাকলে ডিম হয়তোবা ফুটবে না। সে ধারণা থেকে ডিমগুলো জার থেকে সরিয়ে সিস্টার্ণে নামিয়ে রাখলাম। পরে ডিমগুলোকে একটি লোহার দণ্ডের ফ্রেম বানিয়ে ফ্রেমের নীচে আটকিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হল। এভাবে প্রায় ২ দিন পর দেখা গেল ফ্রেমের নীচে ডুবন্ত ডিমগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে যে ডিমগুলো পানিতে ভাসমান ছিল সে ডিমগুলো থেকে কয়েকটি বাচ্চা পাওয়া গেল। এ দিকে একই সময়ে যে পুকুর থেকে মাছগুলোকে ধরে এনে পাকা পুকুরে রেখেছিলাম সে পুকুরে কয়েকটি মাছ ছিল এবং সেখানে প্রাকৃতিকভাবে ২টি বাইশ (শোল মাছের ঝাঁক) দেখলাম। তখনই পাকা পুকুরের সমস্ত মাছগুলোকে পূর্বের পুকুরে স্থানান্তর করলাম। মাছগুলো স্থানান্তরের ১৫ দিন পর প্রচুর পরিমানে শোল মাছের বাইশ (শোল মাছের পোনার ঝাঁক) দিতে লাগল। আর তখন এই বাইশগুলোকে ঠেলে জাল দিয়ে ধরে একের পর সিস্টার্ণে ভরতে লাগলাম। প্রথমে কোন খাবার খাচ্ছিল না। পরে চিংড়ির শুটকি ভালভাবে পাউডার করে দেয়ার পর ধীরে ধীরে খেতে শুরু করল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে শোল মাছের বাচ্চাগুলো চিংড়ির শুটকি খেতে অভ্যসৎদ হয়ে গেল। এভাবে ১ মাসে প্রায় ২/৩ লক্ষ শোল মাছের পোনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু শোল মাছের চাষ পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে বাজারজাত করা যায়নি। শেষ পর্যনৎদ পাশের বিলে অবমুক্ত করা হল। অনেক টাকা বিনিয়োগের লোকসান ঘটিয়ে শোল মাছের পোনা উৎপাদনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

পুকুরে শোল ও টাকি মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতি : আমি আগেই উল্লেখ করেছি- হ্যাচারিতে শোল মাছের পোনা চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে উৎপাদন খুবই জটিল। অন্যদিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শোল মাছের পোনা উৎপাদন করা খুবই সহজ। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শোল মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা করছি-

ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাসে পোনা উৎপাদনের জন্য পুকুর প্রথমে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর ২০/২৫ দিন এভাবে শুকিয়ে রাখতে হবে। এতে পুকুরের তলায় এক ধরনের ঘাস জন্মে। ঘাস জন্মালে পুকুরে পানি দিয়ে ভরতে হবে। এরপর পানির নীচে এসব ঘাস ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে এবং একসময় এই ঘাসগুলো পানির উপর ভেসে উঠবে। এ সময় কচুরীপানাও দেয়া যেতে পারে পুকুরে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কচুরীপানায় যেন পুকুর ভরে না যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, পুকুরে ঘাস হয়ে গেলে কচুরীপানা দেয়ার প্রয়োজন নেই। পুকুরের চারদিকে কমপক্ষে ৫ ফুট উচ্চতায় জাল দিয়ে বেড় দিত হবে। অন্যথায় বর্ষাকালে শোল মাছ লাফিয়ে চলে যাবে। এরপরে পুকুরে শোল টাকি মাছ মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৪টি শোল ও ১০টি টাকি মাছ মজুদ করা যেতে পারে। মজুদের পর খাদ্য হিসেবে কার্প জাতীয় মাছের ধানীপোনা দেয়া যেতে পারে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যাঙ বা ব্যাঙাচি দেয়া যেতে পারে। ছোট ব্যাঙ অনেক সময় লাফিয়ে চলে যেতে পারে। সে জন্য ব্যাঙগুলোকে আধমরা করে দিতে হবে। ব্যাঙাচি দিলে আধমরা করার কোন প্রয়োজন নেই। ব্রুড শোল ও টাকি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যাঙাচির তুলনা হয় না। এ জন্য ব্যাঙাচির চাষ করা যেতে পারে। ব্যাঙাচি উৎপাদন করাও খুব কঠিন কিছু নয়।

বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে শোল ও টাকি মাছ বাচ্চা দিতে (বাইশ) শুরু করে। বাচ্চাগুলো এক ঝাঁকে থাকে। সপ্তাহখানেক বয়সের হলেই ঠেলা জালি দিয়ে বাইশ (পোনার ঝাঁক) ধরে সিস্টার্ণ বা হাউজে নিয়ে যেতে হবে। খাদ্য হিসেবে প্রথম ১/২ দিন কিছুই খেতে চায় না। তারপরে খাবার হিসেবে চিংড়ি শুটকির গুঁড়া ভালভাবে পিষিয়ে দিতে হয়। এভাবে ২/৩ দিনেই খাবারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। এভাবে ১৫ দিন খাওয়ানোর পর পোনাগুলো প্রায় ২/৩ ইঞ্চি সাইজ হয়। এরপর পোনাগুলোকে চাষের জন্য অবমুক্ত করতে হবে।

শোল ও টাকি মাছের চাষ পদ্ধতি : আমাদের দেশে এখনও বাণিজ্যিকভাবে শোল বা টাকি মাছের চাষ পদ্ধতি চালু হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি- শোল মাছ সাধারনত খৈল বা কুড়া দিয়ে বানানো খাবার খায় না। তবে মরা টাটকা মাছ খেতে দিলে এরা খুব খায়। আমাদের দেশে বাস-বতার নিরিখে শোল মাছের একক চাষের সম্ভবনা খুবই কম। কারণ এত কাঁচা মাছ বা শুটকির জোগান দেয়া প্রায় অসম্ভব। তবে যেকোন মাছের সাথে মিশ্রভাবে প্রতি ২ শতাংশে ১টি করে শোল মাছ দেয়া যেতে পারে। শোল মাছের চেয়ে পুকুরে টাকি মাছের চাষ করার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, শুটকি মাছের গুঁড়া মিশ্রিত খৈল ও কুড়া দিয়ে বানানো খাবার টাকি মাছ ভাল খায় এবং বেশ মোটাতাজাও হয় যা শোল মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

শোল মাছ আমাদের দেশে এখন প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতীর মাছ হয়ে যাচ্ছে। এ মাছটিকে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটিয়ে সরকারি উদ্যোগে মুক্ত জলাশয়ে ছাড়লে একদিকে যেমন এ মাছটির

উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়বে অন্যদিকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া শোল মাছটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে অনায়াসে। আবার টাকি মাছটিকেও উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটিয়ে যেকোন মাছের সাথে শতাংশ প্রতি ১০টি মাছ অনায়াসে চাষ করে এর ব্যাপক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

বিভিন্ন মাত্রায় ডোজ দিয়ে চিতলের কৃত্রিম প্রজনন করতে গিয়ে দেখা গেছে, চিতল মাছকে পি.জি. হরমোন দিয়ে ইঞ্জেকশন করার পর স্ত্রী চিতল মাছ ডিম পাড়লে পুরুষ চিতলের ভূমিকা খুবই কম। একইভাবে ফলি মাছের ক্ষেত্রেও চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে পুরুষ মাছকে কেটে স্পার্ম মিশাতে হয়। তাই চাপ প্রয়োগে ডিম বের করার পর পুরুষ চিতল/ফলি মাছের টেস্টিজ কেটে স্পার্ম মিশিয়ে সফলতা পেলেও নিম্নলিখিত কারণে এ পদ্ধতিটি লাগসই বলে আমার কাছে মনে হয়নি।

১. চিতল মাছের ডিমের পরিমাণ খুবই কম এবং ডিমের আকার বেশ বড়। এক একটি ডিমের আকার প্রায় ছোট মার্বেলের মত। একটি বড় চিতল মাছে ৩০০ থেকে ৫০০ ডিমের বেশি থাকে না।

২. প্রাকৃতিকভাবে ডিম দিতে প্রত্যেকবার পুরুষ চিতলের সর্্পামের জন্য একটি পুরুষ চিতল মাছ কাটতে হয় যা অল্প সংখ্যক ডিমের জন্য ঠিক নয়।

৩. চিতল মাছের ডিম ফুটতে তাপমাত্রাভেদে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে। অন্যদিকে কার্প বা রুই জাতীয় মাছের ডিম ফুটতে ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টার উপরে লাগে না। দীর্ঘদিন সিস্টার্ণে ডিম রেখে অল্পসংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন করে ব্যবসায়িকভাবে খুব একটা লাভবান হওয়া যায় না।

এ সব বিভিন্ন কারণে চিতল মাছের কৃত্রিম প্রজননে আশাপ্রদ ফলাফল পাওয়া যায়নি। কৃত্রিম প্রজননের পাশাপাশি পুকুরে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেও চিতল মাছের বাচ্চা ফুটানো হয়। দুটি পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে প্রাকৃতিকভাবে পুকুরেই চিতল মাছের বাচ্চা ফুটানোই ভাল।

পুকুরে চিতল মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতি : জানুয়ারির দিকে প্রথমে পুকুরকে ভালভাবে শুকিয়ে (১৫ দিন) রাখতে হবে। এর ফলে পুকুরের তলায় এক ধরনের ঘাসের সৃষ্টি হলে পানি দিতে হবে। পানি নীচের ঘাসগুলো আসতে আসতে বড় হতে হতে এক সময় পানির উপর চলে আসবে। এভাবে প্রাকৃতিক আশ্রম তৈরি হবে পুকুরে। এ ভাবে মাস খানেক পর অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে পুকুরে চিতল মাছের মাতৃ মাছ এবং পুরুষ ব্রুড মাছ মজুদ করতে হবে। মজুদ ঘনত্ব হবে প্রতি শতাংশে সর্বোচ্চ ৩টি। ব্রুড মাছ মজুদের পর খাবার হিসেবে কার্প বা রুই জাতীয় মাছের ধানী পোনা পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। চিতল মাছ কিছুটা রাক্ষুসে স্বভাবের হলেও বড় মাছ খায় না। খাবার হিসেবে ছোট ছোট মাছ খেতে পছন্দ করে। কার্প জাতীয় মাছের ধানী পোনাও ছাড়াও তেলাপিয়ার ছোট ছোট বাচ্চা খেতে পছন্দ করে। সে জন্য পুকুর প্রস্তুতি এবং পানি দেয়ার পর কিছু সংখ্যক ব্রুড তেলাপিয়া ছাড়তে হবে। তাতে তেলাপিয়া প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাচ্চা দেয়া শুরু করবে। আর সে বাচ্চা চিতলের খাবার হিসেবে চলে যাবে।

চিতল মাছ সাধারণত এপ্রিলের শেষের দিকে অর্থাৎ জুলাই মাস পর্যনন্দ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাতে পুকুরে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ডিম দিয়ে থাকে। আর সে জন্য প্রজনন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার জন্য এপ্রিলের শেষ দিক হতে জুলাই পর্যনন্দ পুকুরে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানির প্রবাহ দেয়া উচিত। তাতে চিতল মাছের প্রজনন প্রক্রিয়ায় দ্রুত সাড়া দিয়ে ডিম পাড়া তরান্বিত হবে। চিতল মাছের ডিম আঠাল। আর সে জন্য চিতলের ডিম সংগ্রহের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ডিম সংগ্রহের জন্য কাঠের ফ্রেম বানিয়ে দিতে হবে। কাঠের ফ্রেম অনেকটা ছোট নৌকার মত এবং তা ডুবিয়ে রাখতে হবে। চিতলের ডিম সংগ্রহের জন্য এ ব্যবস্থা নিলেই চলবে। এ প্রক্রিয়াটি এপ্রিলের আগেই করে রাখতে হবে। মে মাস থেকেই চিতল মাছ ডিম পারতে শুরু করবে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমের প্রতি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা রাতে এরা ডিম পারে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ২/৩ দিন পর কাঠ দিয়ে বানানো নৌকাটিকে পানির উপর তুলে দেখতে হবে ডিম দিয়েছে কি-না। যদি ছোট নৌকাতে ডিম দেখা যায় তাহলে ডিমসহ নৌকাটিকে নার্সারি পুকুরে স্থানানন্তরিত করতে হবে।

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি : চিতলের ডিমের সংখ্যা যেহেতু কম সেহেতু ছোট ছোট নার্সারি প্রস্তুত করতে হবে। সাধারণত ৫ শতাংশের পুকুর নার্সারির জন্য নির্বাচন করতে হবে। প্রথমে পুকুর শুকিয়ে পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে শ্যালো দিয়ে পরিষ্কার পানি ২/৩ ফুট পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। তারপর চিতলের ডিমসহ ছোট নৌকাটিকে নার্সারি পুকুরে খুব তাড়াতাড়ি করে সর্তকতার সাথে এনে ডুবিয়ে রাখতে হবে। যেহেতু চিতলের ডিম ফুটতে প্রায় ১৫ দিনের মত লাগে সেহেতু ডিম দেখে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত করা ভাল। আর তা না হলে আগেই নার্সারি পুকুর প্রস্তুত হয়ে গেলে পানি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পানি পরিষ্কার না হলে চিতলের ডিমে ফাঙ্গাস পড়তে পারে। এ ভাবে ডিম সংগ্রহ করে নার্সারিতে নেয়ার পর তাপমাত্রাভেদে ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হবে। বাচ্চা ফুটার পর খাদ্য হিসেবে কার্প জাতীয় মাছের রেনু পুকুরে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চিতলের বাচ্চা পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটার পর পরই প্রায় ১/২ ইঞ্চি সাইজের হয়ে থাকে। এভাবে নার্সারি পুকুরে সপ্তাহ দুয়েক রাখার পর প্রায় ৩ ইঞ্চি সাইজের হয়ে থাকে। এরপর চিতলের পোনাকে চাষের পুকুরে ছাড়তে হবে। নার্সারি পুকুরে ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি সাইজের ফাঁসের জাল রাখতে হবে যাতে সাপ আটকে যায়।

চিতলের চাষ পদ্ধতি: আমাদের দেশে এখনও চিতলের একক চাষ পদ্ধতি চালু হয়নি। পোনা প্রাপ্তির অভাবে মিশ্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে চিতলের চাষ শুরু হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতি ৫ শতাংশে অন্যান্য মাছের সাথে ১টি করে চিতল দিলে ১ বছরে প্রায় ২ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। এর জন্য বাড়তি খাবারের প্রয়োজন নেই।

চিতলের রোগবালাই: নীবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে চিতল মাছের প্রজননের সময় পুরুষ চিতল মাছ স্ত্রী চিতল মাছের সাথে জড়াজড়ি করে একটি আরেকটিকে আক্রানৎদ করে ফেলে। বিশেষ করে এদের মুখের দিকে কাঁটা বা বুকের নীচে কাঁটা দিয়ে একে অপরকে নিজের অজানৎেদই আক্রানৎদ করে যা পরবতর্ীতে সমসৎদ শরীরে ক্ষত রোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে। এজন্য প্রত্যেকবার ডিম দেয়ার পর পুকুরে পটাসিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট ছিটিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এতে প্রজননের পর আক্রানৎদ মাছগুলো দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। মিশ্র চাষে চিতলের রোগ বালাই নেই বললেই চলে।

উপরোল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করে যে কেউ চিতলের পোনা উৎপাদন করতে পারবে। যা মিশ্রচাষে খুব ভাল মুনাফা ঘরে আসবে পাশাপাশি চিতলের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

লেখক: এ. কে. এম. নূরুল হক
স্বত্বাধীকারী-ব্রহ্মপুত্র ফিস সীড কমপ্লেক্স (হ্যাচারি)
শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ